শক্তির নানা মূর্তি

কালী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হিন্দুদের দেবদেবী সাধারণত সুন্দর রূপেই কল্পিতা। লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিবের সতী বা গৌরী সুন্দরী নারী। রাধাও সুন্দরী, সীতাও সুন্দরী। সীতার স্বামী রাজপুত্তুর হলেও শ্যামবর্ণ, রাধার প্রেমাস্পদ তো নামেও কৃষ্ণ, বর্ণেও কৃষ্ণ, তবু তাঁর মুখশ্রী দেখে গোপীরাও তো পাগল। সতীর স্বামী শিব শ্বেতকায়, কিন্তু তাহলে হয় কি, সে তো ভিখারি, সন্ন্যাসী।

কিন্তু শিব-সুন্দরের একটি শক্তি আছেন, তিনি ঘোর কৃষ্ণা। শুধু কৃষ্ণাঙ্গী নন, তিনি বিকট-দশনা, উলঙ্গিনী, প্রলয়ঙ্করী শ্যামা। শিব, যাঁকে বলা হয় প্রলয়ের দেবতা—তিনি এই কৃষ্ণাঙ্গী শ্যামার নিকট স্তব্ধ শান্ত হয়ে পড়ে আছেন শবের মতন। সমস্ত শান্ত, স্তব্ধ, সুন্দরকে ধ্বংসিত করার মূর্তিতে। প্রকৃতিতে অজ্ঞাত নয়। 'সিন্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্য-নবীনা'—'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে আর এক হাতে হার।' এই তো মহাকালী কালস্বরূপিণীর মূর্তি।

এই কালী একমাত্র দেবী, যিনি বাংলাদেশে বৎসরের নানা সময়ে পূজা পান। এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কয়েক স্থানে স্থায়ী মন্দির আছে যেখানে নিত্য পূজাও হয়। অসময়ে রক্ষাকালীর পূজা হয়—মারী ভয়ে ভীত ভক্তেরা ছাগ শিশু বলি দিয়ে দেবকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করে। দস্যুরা ডাকাতে-কালীর পূজা করে, ঠগীরা কালী পূজা করত, চম্বলের দস্যুরা আধুনিক কালে ঘোরাশক্তির সাধক। বাংলার রুদ্রপন্থীরা কালীর কাছে প্রতিজ্ঞা করত মন্ত্রগুপ্তি রাখবে, মৃত্যুবরণ করবে কর্তব্য সাধনের জন্য। শিব-শক্তির মধ্যে কালী বা কালিকা বাংলাদেশে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হয়ে ওঠেন—মনসা, শীতলা, অন্য দেবীরা ম্লান হয়ে এসেছেন। চণ্ডিকা, অম্বিকা বা কাত্যায়নী নানা নামে শাস্ত্রে কল্পিত হয়েছেন।

এই বিচিত্ররূপিণী দেবী মহিষ (মহীশ) অসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, মধুকৈটভ আদি দৈত্যদের নিধন করেছেন সত্য, কিন্তু দেবীর সে রূপ প্রচলিত কালীর রূপের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সমাজ-জীবনের নানা ভাবনা রূপ পায় ধর্মচিন্তায়। মধ্যযুগে নারীদেবতাদের প্রাধান্য লাভের পটভূমে সমকালীন ইতিহাস জড়িত আছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। মধ্যযুগের বাংলাদেশে তুর্কি-মুঘল শাসনকালে মাৎস্যন্যায় ছিল মানবধর্ম;—অর্থাৎ ধনী নির্ধনকে শোষণ করছে, সবল দুর্বলকে পীড়ন করছে, পুরুষ নারীর প্রতি অত্যাচার করছে, এই সবই ধর্মকাহিনিতে রূপায়িত হয়েছে। বিত্তবান অসচ্ছল শিব-সংসারের চিত্র এঁকেছেন সাধক-কবিরা কালের অবস্থা দৃষ্টে।

এক একবার মনে হয়, অপমানিত নারীর-প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের চিত্র ফুটে উঠেছে মেয়ে দেবতাদের মধ্যে। মনসা, চণ্ডী, শীতলা ধাপে ধাপে হিংস্রতার উগ্রতায় ভীষণ থেকে

ভীষণতর হয়ে উঠেছেন। সতী ও দুর্গা শিবের গৃহিণী। সতী অতি নিরীহ নারী, পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন। দুর্গা তেমন শান্ত বধূ নন। তিনি স্বামী শিবের দ্বারা অমর জীবন বরপ্রাপ্ত অসুর, দৈত্য-দানবদের বধ করলেন। তৃতীয় ভার্য্যা কালী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছেন, পদতলে চেতনাহীন স্বামীকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছেন যেন। শিবের সঙ্গীরা ভূত-প্রেত, শিব-শক্তিদের সঙ্গিনী যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনীরা, পুরুষ দেবতার পুরুষ অনুচর, মেয়ে দেবতার মেয়ে সঙ্গিনী। শিব দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করবার সময় ভূত-প্রেত সঙ্গে নিয়েছিলেন, অসুরনাশিনী কালীর সঙ্গে আছেন ডাকিনীরা। মোটকথা, সমাজে-সংসারে হিন্দু নারীর হীন অবস্থার প্রতিক্রিয়ার জন্য নারীদেবতাকে এমন শক্তিশালিনী করে কল্পনা করা হল কি?

"কালী করালবদনা ঘোর মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, দেবীর অধঃহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড, ঊর্ধহস্তে খড়্গ, আর দক্ষিণদিকের ঊর্ধহস্তে 'অভয়মুদ্রা' এবং অধঃহস্তে বরমুদ্রা। দেবী মহামেঘ-প্রভা, শ্যামা দিগম্বরী। দেবীর কণ্ঠস্থিত মুণ্ডমালা থেকে বিগলিত রুধির-ধারায় তাঁর দেহ চর্চিত। দুটি শবশিশু দেবীর কর্ণভূষণ হওয়াতে তাঁকে ভয়ঙ্করী দেখাচ্ছে। তিনি ঘোরদ্রংষ্টা[১] করাল আস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা। তাঁর কাঞ্চি শবহস্ত নির্মিত। তিনি হাস্যময়ী। দেবীর দুই ওষ্ঠাধর থেকে রক্তধারা বিগলিত হওয়ায় তিনি দীপ্ত বদনা। মহারৌদ্রী শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোররবকারিণী, তিনি ত্রিনয়না।...তিনি দন্তুরা। তাঁর কেশরাশি ডানদিকে এলায়িত, তাতে মুক্তা খচিত। দেবী শবরূপী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতি নিয়ত। তিনি সুখপ্রসন্নবদনা এবং তাঁর মুখপদ্ম ঈষৎ হাস্যযুক্ত।" ১

জগৎব্যাপী প্রকৃতির এই রূপ যুগপৎ দৃষ্ট হচ্ছে—কোথাও হিংসা, কোথাও সম্ভোগ। এই তো দৃশ্যমান জগৎ। এই কালী বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের, ব্রাহ্মণ সাধকদের ধ্যানগত আদ্যাশক্তি। পুরোহিতরা কালীপূজা করেন সংস্কৃত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে। কিন্তু তিনি বাঙালি ভক্তের উমা, সতী, কালী রূপে দেখা দিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকে এই সাধনা নতুন সংগীতে রূপ নিয়েছে। উমা-সতী সম্বন্ধে সংগীতের আলোচনা প্রথমে করে, পরে আমরা কালী-সংগীত সম্বন্ধে আলোচনায় আসব।

শক্তি বিষয়ক ধর্মসংগীতের পটভূমে রয়েছে বাংলা সাহিত্যে হরগৌরীর বাস্তব রূপ কল্পনা। সতী-গৌরীর চরিত্র কল্পনা সৃষ্টি বাঙালি কবির নিজস্ব।

কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে শিব বিবাহের যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তা ক্ষীণ বাঙালি কবিদের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু জামাতা শিব মহাদেব মহেশ্বর হয়েও চির ভিখারি।[২] ধনী শ্বশুরের গরিব জামাতা—এ তো সংসারেও দেখা যায়, কন্যা হয়েও পিতৃগৃহে

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার কালীমাতার ধারণা আলোচনা করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে।

২. শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতের শক্তি সাধনা ও শক্তি সাহিত্য। ৩য় অধ্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে দেবী। পৃ. ৯০-১২৮।

অভাবের তাড়নায় আশ্রয় নিতে চায় না।

বাঙালি কবিরা লেখনীতে গিরিরাজ ও মেনকার সংসারের দায়িত্বের ছবি ফুটিয়েছেন নিজেদের দিকে তাকিয়ে। কালিদাস ও উজ্জয়িনীর রাজসভায় লালিত, তাঁর লেখনীতে কুমারসম্ভবের নায়ক-নায়িকারা রাজোচিত ঐশ্বর্যের মর্যাদা পেয়েছেন। বাঙালি কবির সৃষ্ট গিরিরাজ মেনকার অভাবের সংসারে অষ্টম বর্ষীয়া গৌরীর বিবাহ হবে। কালিদাস ঘটক করে এনেছিলেন অরুন্ধতী সহ সপ্তর্ষিদের। বাঙালি কবিদের কাছে সুপরিচিত ঢেঁকিবাহন নারদমুনি তাঁকেই গৌরীর বর অন্বেষণে নিযুক্ত করেছেন তাঁরা। ফলে বর জুটল—'বহুপত্নীক' কপর্দকহীন, ভাঙ্‌খোর প্রায় দিগ্‌বসন।' বর দেখে পাড়া-পড়শি অবাক। স্বামী ঘরে আট বৎসরের গৌরী থাকেন, 'গৌরীই কালী হন কালে।' 'দুঃখে-দারিদ্রের নিষ্পষণেই গৌরীর সোনার অঙ্গ দুই দিনে কালী' হয়ে গেল—এই কথা গাইলেন বাঙালি কবি—

"বাছার নেই সে আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ।
হেরে তার আকার চিনে ওঠা ভার,
সে উমা আমার উমা নাইহে—আর।"

মেয়ের সব আভরণও ভিখারি ভোলা বেচিয়া খাইতেছে—[১]

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা বুঝি আমার কেঁদেছে
উমার যতেক বসন-ভূষণ,
ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে।"

এই ভোলানাথের হাতে পড়ে উমা 'অস্থিচর্মসার' 'নির্মাংসা' চামুণ্ডা কালী হয়ে উঠেছেন। এইটিতে রঙ চড়িয়ে এক কবি লিখলেন—

"শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে-ভেবে কালী হয়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে।
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধা পানে।।"[২]

চণ্ডিকা-বিজয় বা চণ্ডী-মাহাত্ম্যের অনুবাদ থেকে আমরা চণ্ডীকে মধু পান করতে দেখি—যোগিনী-ডাকিনীরা তাঁকে সুরা জোগান দিচ্ছেন।

---

১. হরিশ্চন্দ্র মিত্র : শাক্ত পদাবলী—উদ্ধৃতিঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। পৃ. ২৩৮।

২. 'সাহেব-বিবি-গোলাম—এর বউরাণীর দশা

স্বামী রাত্রিতে বাড়িতে আসেন না, নেশা করে শ্মশানে পড়ে থাকেন ভূত-প্রেতদের সঙ্গে;—এই দেখে উমারও জেদ চেপে গেল—তিনিও বেশ-ভূষা ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন শ্মশানের দিকে, সঙ্গিনী হল যোগিনী-ডাকিনীরা; শিব নেশা করেন ভাঙ খেয়ে—বিদ্রোহিনী নারী পান করে মধুসুরা! যেন আধুনিকা বিদ্রোহিনী নারী!

এইসব বাস্তব-বর্ণনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাধকরা, যেমন পরকীয়া প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান দিয়েছেন বৈষ্ণব-সাধকরা। শক্তি-সাহিত্যে উমা-কালী তত্ত্ব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রামপ্রসাদ প্রমুখ শক্তি সাধকগণ কালীর বিভীষিকাময়ী মূর্তিকে মাতৃরূপে দেখেছেন, তেমন আর কেউ দেখতে পায়নি। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে অতিবিস্তারে এই সাধকের জীবন ও সাধনতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন এবং সাধক কবির গান ও কাব্য সংগ্রহ করেছেন।

রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে ১৮৩৩ শব্দে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত বলি, সেই বৎসর বিলাতে রামমোহন রায়ের দেহান্ত হয়। এই 'কালীকীর্তন' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংগ্রহকারের উক্তি' নাম দিয়ে কবিতায় ভূমিকা লেখেন। বাংলার শেষ কবিয়াল ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের ত্রিপদী অংশ থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি—

"কে জানে কালীর মর্ম নখ জ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম
ভাবে মত্ত গর্ব সর্বসহা।
ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে
যেমন চুম্বকে টানে লোহা।।
ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপে ব্রহ্মময়ী
কুলকুণ্ডলিনী হংস বধূ।
দুর্গা নামামৃত পানে সবিশেষ গুণগানে
বদনকমলে ক্ষরে মধু।।
কখনো পদ্মিনী বামা কখনো চিত্রিণী রামা
ছলেতে পুরুষ ছলে নারী।
নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে
সারমর্ম বুঝিতে না পারি।।
ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি
অন্নদা অম্বিকা কাশী মধ্যে।
কমলে কমলা হন মাতা কত মাতে রণ
হরগৌরী হন মধ্যে মধ্যে।।
দ্বৈতভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর
লহ লহ সার উপদেশ।
জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্মা গুণধাম
ধারণ করেন নানা বেশ।।
যে জন যে ভাবে ভাবে তারে তুষ্টে সেই ভাবে
না দেয় ভক্তের মনে কালি।
সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম
বিধি বিষ্ণু যা রাধা মা কালী।।"

নানা মূর্তির একীকরণ বা সমীকরণ প্রয়াস দেখা দিল—

কৃষ্ণ রণে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে
প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল
কৃষ্ণবনে নানা ছলে গোপিকার মন ছলে
মনোরম্য স্থান সে গোকুল।।
রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি
কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে।
লজ্জা-ভয় পরিহরি মুখে বলে হরিহরি
হরিপ্রেম ভূষা অঙ্গে পরে।।
কালী রূপে কাল পরে কটি পরে কর পরে
গলে দোলে শব মুণ্ড সব।
এলোকেশী সর্বনাশী অট্টহাসি সর্বনাশী
অসি করে রণ করে শব।।
শিবরূপে যোগ বলে সদা বোম্ বোম্ বলে
হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে।

অতঃপর রাম-সীতা কথা বলে পুনরায় বলেছেন—

হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বাস্তু আদি
কালী রাঙা পায় রাখ মন।
এক ভিন্ন দুই নয় কিরূপ যে জন কয়
ধরাতলে মূঢ় সেই জন।।
উপাসনা ভেদ মাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র
রবিচ্ছায়া দেখ সেই জলে।
হ'বে ব্রহ্মা নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্বক্ষণ
প্রশংসা প্রদীপ তবে জ্বলে।।
অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্মের বর্গ
ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ।
না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ
ঈশ্বরের ভাব সদা লহ।।[১]

প্রসঙ্গত বলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই কবিতায় রামমোহন রায়ের অদ্বৈতবাদী অভাব যোগো পড়েছে। শিব-দুর্গা, হর-পার্বতী, রাম-সীতা প্রভৃতি যুগ্মনাম এবং কালী ও কৃষ্ণ বা শাক্ত বৈষ্ণবী তত্ত্বের সমীকরণ প্রচেষ্টা দেখতে পাই রামপ্রসাদের রচনায়—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।

পৃথক প্রণব নানা লীলা তব
কে বুঝে একথা বিষম ভারি।।
নিছে তনু আধা গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এসে পীত ধটি
এল চুল চুড়া বংশী ধারী।।
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস
এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী।
পূর্বে শোণিত সাগরে নেচেছিল শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি।।
প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে
বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামা তনু
একই সকল বুঝিতে নারি।। (৮৬নং গান)

সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা রামপ্রসাদের গানে পাই—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি।।
মগে বলে 'ফয়া' তারা 'গড' বলে ফিরিঙ্গি যারা মা
'খোদা' বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।।
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের ভক্তি
গৌরী বলে সূর্য তুমি বৈরাগী কর রাধিকাজী।।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ্যাম
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালী জেনো এসব জানে।
এক ব্রহ্মা দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজী।।
মন কর না দ্বেষাদ্বেষি। যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদ আগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসি।।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম, সকল আমার এলোকেশী।
শিব রূপ ধরে শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।।
ওমা রামরূপে ধর ধনু কালীরূপে করে আসি।
দিগম্বরী দিগম্বর পীতাম্বর চিরবিলাসী।।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী।
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে শিশু সঙ্গে এক বয়সী।।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপনার কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী।। (পৃ. ১৬৮)

রামপ্রসাদ কালীসাধক পূর্বে বলেছি তাঁর কালী জননী সদৃশা। উমা-পার্বতীর রূপ মধুর রসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভক্তেরা—আগমনী ও বিজয়া সংগীতের প্রতিটি ছত্র সেই মধুর রসে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু অসুর-বিনাশিনী দুর্গা বা বিভীষিকাময়ী বিকটদশনা কালীকে মধুর রসে প্রতিষ্ঠিত করে রামপ্রসাদ প্রমুখ সাধক কবিগণ নতুন ধর্মসাহিত্য রচনা করেছেন। এই রচয়িতাদের মধ্যে আছেন দাশরথি রায়, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ) প্রভৃতি। সেকালের জমিদার রাজারাও শৌখিনভাবে গীত রচনা করতেন শাক্ত পদাবলীতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহাতাব চাঁদ, মহারাজ শিবচন্দ্র, নন্দকুমার রায় প্রভৃতি। শৌখিনভাবে ত্রিপুরেশ্বদেব বৈষ্ণব গান লিখতে দেখা যায়। *

দুর্গা-কালী সমন্বয়ের চেষ্টা তেমন বিস্ময়কর নয়। কিন্তু কাল ও কালী বা শ্যামা ও শ্যামের মধ্যে সাধকরা যে সমন্বয় করেছেন, তা বিশিষ্ট কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য বাউলদের গানের কথা বাদ দিলাম। আমরা মনসামঙ্গলে দেখেছি স্বামী চাঁদ সদাগর শিব পূজক, স্ত্রী গোপনে মনসা পূজা করে, সেখানে উভয় দেবতার মধ্যে বিরোধটাই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। নারী দেবতার জয় হল ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে তাকে ঠিক সমন্বয় বলা যায় না এক দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের পরাভব স্বীকার করে নিয়ে গোঁজামিলের মধ্যে মিল দেখানো হয়েছে। শিব-শক্তি অদ্বৈত তবুও সেখানে বিসদৃশ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরুষ দেবতার পরাজয় ঘটিয়েছেন নারী দেবী। ভক্ত লেখকরা, নারী দেবতার অনুকূলে রায় দিয়ে জয়ী করেছেন নারী দেবতাকে। নারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, ঘরে বিদ্রোহী নারী যদি রাধা ও গোপীদের পরকীয়া সাধনতত্ত্ব সমাজ সংসারে অনুসরণ করেন তবে তো মান-সম্মানই থাকবে না; তাই তাদের পোষণ চলছে দেবী বলে লক্ষ্মী বলে, সারাজীবন খেটে খেটে নারীকে খুশি করেছেন গৃহ দিয়ে, অলঙ্কার দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, সন্তান দিয়ে। মূঢ় পুরুষ প্রকৃতির দান।

একদিন শাক্ত ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে মূলগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরতলার ব্রাহ্মণ গোঁসাই পণ্ডিতরা জনতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তারপর একদিন জনতার প্রতিনিধিরাই সমন্বয়ের জন্য এগিয়ে এলেন। একটা ছোটো উদাহরণ দিই—শ্রীরাধার স্বামী আয়ান ঘোষ শক্তিহীন হয়েও প্রকাশ্যে শক্তির উপাসক ও কালীভক্ত। কিন্তু রাধা গোপনে যে কৃষ্ণ পূজা করেন। ননদিনী কুটিলা গিয়ে ভাইকে জানায় যে, রাধা লুকিয়ে কৃষ্ণ পূজা করে। আয়ান বোনকে নিয়ে এসে দেখেন সব।

এই দৃশ্য বানিয়েছেন দাশরথি রায়—

কুঞ্জ কাননে কালী ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত,

---

* 'শাক্ত পদাবলী'র সংগ্রাহক সম্পাদক অরমেন্দ্র নাথ রায় সাড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি সংখ্যা শাক্ত-সংগীত সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে ৩য় সংস্করণে (১৩৫৯) মাত্র ৩৩৫টি গান মুদ্রিত করেন।

শ্যাম শ্যামা ভেদ কেন কর রে জীব ভ্রান্ত।।
পীতাম্বর পরিহরি হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।
কি বা কালশশী লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত।।
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধ তুলসী দিয়ে
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রঙ্গিণী রাই করে সেবা।
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত।।[১]

এই সমন্বয়ের ভাবনা সাধারণ পাঁচালিকারের মনেও উদয় হয়। লবাই ময়রার গান উদ্ধৃত করছি—

"হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
একবার হয়ে বাঁকা দে মা দেখা
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।।
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীত ধড়া,
মাথায় দে মা মোহন চূড়া চরণে চরণ থুয়ে।।
ত্যজি নর শির মালা পর গলে বনমালা
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা
ও পাষাণের মেয়ে।।
হৃদ্‌কমলে কালশশী দেখতে আমি ভালবাসি,
একবার ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী
ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইয়ে।[২]

রামপ্রসাদ সেনের অনুরূপ একটি গান তুলে দিচ্ছি এখানে—

"ও মন তোর ভ্রম গেল না
পেয়ে শক্তি তত্ত্ব হবি মত্ত
হরি হর তোর এক হল না।।
বৃন্দাবন আর কাশী ধামের
মূল কথা মন বোঝো না।
কেবল ভাবচক্রে বেড়াও ঘুরে
করে আত্ম প্রতারণা।।
অসি-বাঁশীর মর্ম বুঝে
(তোমার) কর্ম করা আর হলো না।

---

১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভারতের শক্তি সাধনা। পৃ. ২২৩-২৪।
২. শাক্ত-পদাবলী ২২০ নং

যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাবনা।।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা।
(তুমি) শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর
চক্ষু থাকতে হলে কানা।।

(শাক্ত-পদাবলী—২৭৩নং)

দুর্গা পূজার পূর্বে ও পরে উমা-ভবানীর উদ্দেশ্যে আগমনী ও বিজয়ার গান খুবই মধুর—বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনে বিবাহিত কন্যার পিতৃ-আলয়ে আগমন ও স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে সকলের মনের ভাব বর্ণিত হয়েছে, এই সব গান ও কবিতায় সুন্দর মধুর ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্ব এতে নাই—কেবল lyric সৌন্দর্য আছে। কিন্তু রামপ্রসাদ প্রমুখ দেবীভক্তেরা কালীকে ভক্তিভরে নতুনভাবে গানে ব্যক্ত করলেন। বিশ্বাত্মা বিশ্বমাতা মহাকালী কালস্বরূপিণীকে এভাবে ইতিপূর্বে কোনও সাধক সাধন করেননি।

কালীর দেবীরূপ কল্পনার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে যাদের 'শবর' নামে সাধারণ সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা হত, তাদের মধ্যে 'তামসিক' পূজার দেবী নানা নামে খ্যাত ছিলেন। কালী, কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি কত নাম। মদ্য-মাংস, গান, আহার, রুধির প্লাবিত পূজোপকরণ। 'শবর' সংজ্ঞাদি সাধারণভাবে কালে ব্যবহৃত হত, যেমন হয় হরিজন বা শূদ্র শব্দ। শূদ্র হরিজন শব্দের দ্বারা কোনও একটি 'জাতি' বুঝায় না। ভদ্রেরা এই সাধারণ নামটি ব্যবহার করে আসছেন। রামায়ণে শবরীর প্রতীক্ষা দেখে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রথের শবরদের পক্ষকালের জন্য মন্দিরে প্রবেশ ও বাসাদি শাস্ত্র বা লোকাচার সম্মত প্রথা। এই বিচিত্র উপজাতির মধ্যে যে মাতৃরূপা দেবীর তামসিক পূজা ছিল ব্রাহ্মণরা কালীদেবীর নানা রূপ বলে সমন্বিত করলেন। প্রত্যেক উপজাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করলেন ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রাদি রচনা করলেন দেব-ভাষায়। বিরাট কালীতত্ত্ব রচিত হল। কালে হিন্দু বাঙালি কালী-সাধক বলেই পরিচিত হল বাংলার বাইরেও—কারণ প্রত্যেক শহরে-নগরে কালীবাড়ি গড়ে তোলেন বাঙালি উপনিবেশিক বা চাকুরেরা। বিষ্ণুবাড়ি, কৃষ্ণবাড়ি দেখা যায় না। বৈষ্ণবদের তীর্থস্থানে আছে মঠ, আখড়া, রাধাকৃষ্ণের মন্দির। কালীবাড়িগুলি হয়েছে তীর্থযাত্রী ভ্রমণ-বিলাসীদেরও আশ্রয় স্থল, নানাপ্রকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ক্ষেত্র। প্রবাদে বলে, যেখানে বাঙালি সেখানে পাঁঠাবলি অর্থাৎ কালীপূজা।

কিন্তু বাঙালি সাধকরা শবরের হিংস্রক কালীকে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করল ভক্তি দিয়ে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক। তাঁর গানের কথা আমরা আলোচনা করেছি।

শক্তি সাধনতত্ত্ব আলোচনা শেষ করবার পূর্বে একটা বিষয়ের প্রতি আমাদের মন ফেরাতে হবে। আমরা পূর্বে বলেছি যে উচ্চবর্ণের সংস্কৃত ভাষায় আলোচিত ধর্মকথা চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আশেপাশে ও নিম্নস্তরে বিস্তারিত হয়—একে আমরা বলেছি Percolation।

বাংলাদেশে তন্ত্রাচার বা তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের সঙ্ঘ ছিল সুদৃঢ়। কিন্তু তা ছিল গোপন আচারে সীমিত esoteric। তৎসত্ত্বেও সে সব তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবদের মধ্যে। তন্ত্রাচারের বড় কথা তারা অদ্বৈতবাদী, জাতিধর্মের বিরোধী সকল লৌকিক ব্যবহারে জাতিভেদ নিন্দাকারী। চৈতন্যের ধর্মে তার শ্রেষ্ঠ বাণী শোনা গিয়েছিল। চৈতন্য-ধর্ম প্রচারক নিত্যানন্দ ছিলেন অবধূত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্পর্শ, আচার-বিচার ছিল না তাঁর।

তন্ত্রের প্রভাব ঊনবিংশ শতকের আরম্ভ ভাগে রামমোহন রায়ের উপরেও পড়ে, তাই তিনি সর্ব মানবকে তাঁর ধর্মসাধন ক্ষেত্রে আহ্বান করতে পেরেছিলেন কিন্তু সাধারণ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে দেখার যে শিক্ষা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হয়েছে হিন্দু সমাজ-জীবনে এ রূপায়িত হয়নি, তা সীমিত ছিল পূজাক্ষেত্রে চক্র মধ্যে। বাণী ও জীবনের মধ্যে সংগতি খুঁজে পাওয়া গেল না সমাজে-সংসারে। সেখানে সংস্কারই প্রাধান্য লাভ করল। সাধকের জীবনকে গৃহীভক্তেরা আপন জীবনে রূপদান করতে পারেননি। দুই-তিন পুরুষ যেতে না যেতে ঝিমিয়ে পড়ে মনের আবেগ, পারিপার্শ্বিকদের দৃষ্টান্তে বাঁধা সড়ককেই সহজ ও সরল বলে মেনে নেন। এই সামাজিক অনাচার ও মানসিক অসাড়তার বিরুদ্ধে একদিন জাগে যুব মন। আসে ধর্মের বিপ্লব, রাজনীতিতে বিপ্লব। উদ্ভব হয় নতুন ধর্মের।

আবার প্রাচীন ধর্মকে নতুন করে রূপদানের প্রচেষ্টা শুরু করেন এক শ্রেণীর লোক। প্রথমটাকে বলব Revolution, অপরটিকে বলব Revisionism পুরাতনের পুনর্বিচার—New wine in old bottle, আর প্রথম দলের উৎসাহী ভক্তেরা সমস্ত প্রাচীনকে অতীতকে মুছে ফেলে নব বৃন্দাবন গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। দোলায়মান চঞ্চল গতিকে মনে করেন প্রগতি বা প্রোগ্রেস। আবার কালান্তরে সব ঘুলিয়ে যায়—মনে করে গতানুগতিককেই মেনে চলাই নিরাপদ।

লেখক পরিচিতি — রবীন্দ্র জীবনীকার